আমাদের গাণিতিক মহাবিশ্ব

ম্যাক্স টেগমার্ক

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মহমুদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাশূন্যে আমাদের অবস্থান

মহাশূন্য অনেক বড়। সত্যিই বড়। আপনার বিশ্বাসই হবে না এটা কতটা অসামান্য ও বিস্ময়কর রকম বড় এটি।

-ডগলাস অ্যাডামস, দ্য হিচহাইকার'স গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি

মহাজাগতিক প্রশ্ন

একজন ছাত্র ক্লাসে হাত তুলল। মাথা নেড়ে অনুমতি দিলাম। প্রশ্নটি হলো, “স্থানের কি শেষ আছে?”

শুনে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। বাহ! বাচ্চাদের সামনে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ছোটখাট একটি লেকচার দিয়ে থেমেছিলাম। আয়োজনটি ছিল।উইনচেস্টারে স্কুলের পড়া শেষে। কিন্টারগার্ডেনের দারুণ মেধাবী এই বাচ্যগুলো মেঝেতেই বসে কথা শুনছিল। দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা। অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্যে। আর পাঁচ বছরের এই বাচ্চাটি আমাকে এমন এক প্রশ্ন করে বসেছে যার উত্তর আমি দিতে পারি না। আসলে আমাদের গ্রহের কেউই এর উত্তর দিতে পারবে না। অথচ এটি নৈরাশ্যের জন্ম দেওয়ার মতো অধিবিদ্যার**\*১** কোনো প্রশ্ন নয়। এটা সত্যিকারের একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। একটু পরেই আমি যেসব তত্ত্বের কথা বলব সেগুলো দিয়ে এটি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে চলমান নানান পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশ্নটির উত্তর আরও খোলাসাও হচ্ছে। আসলে আমি মনে করি, আমাদের ভৌত বাস্তবতা সম্পর্কে এটি আসলেই দারুণ একটি প্রশ্ন। পঞ্চম অধ্যায়ে গেলে আমরা দেখব, এই প্রশ্নটি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সমান্তরাল মহাবিশ্বের দিকে নিয়ে যাবে।

বিশ্বের খবরাখবর দেখতে দেখতে কয়েক বছর ধরে আমি মানুষের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই শিশুটি আমাকে মানবজাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা যদি এমন বড় জিনিস চিন্তা করতে পারে তাহলে আমাদের বড়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সঠিক পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নের শক্তিও থাকবে। সে আমাকে ভালো শিক্ষণের গুরুত্বও মনে করিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই কৌতূহল নিয়ে জন্মাই। এরপর স্কুলে যাওয়ার পর কোনো এক সময় সেই জিনিসটি আমরা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। আমার মনে হচ্ছে, শিক্ষক হিসেবে তথ্য পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার মূল দায়িত্ব নয়। বরং দায়িত্ব হলো, প্রশ্ন করার সেই হারানো উৎসাহটুকু ফিরিয়ে দেওয়া।

আমি প্রশ্ন শুনতে ভালোবাসি। বিশেষ করে বড় প্রশ্ন। মজার মজার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সময় কাটাতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এটাকেই আমার কাজ ও জীবনধারণের উপায় বলতে পারাটা আমার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার, যা আমরা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। যে প্রশ্নগুলো আমি পাই তার মধ্যে সেরা ১৬টি হলো এ রকম:

১. স্থান কীভাবে অসীম না হয়ে থাকতে পারে?

২. সসীম সময়ে অসীম স্থান কীভাবে তৈরি হতে পারে?

৩. মহাবিশ্ব কিসের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে?

৪. স্থানের কোথায় আমাদের বিগ ব্যাং বিস্ফোরণটি ঘটেছিল?

৫. বিগ ব্যাং কি একটিমাত্র বিন্দুতে ঘটেছিল?

৬. মহাবিশ্বের বয়স যদি মাত্র ১৪ শ কোটি বছরই হয় তাহলে আমরা ৩ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তু কীভাবে দেখি?

৭. গ্যালাক্সিরা বা ছায়াপথরা আলোর চেয়ে বেশি বেগে চললে কি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না?

৮. গ্যালাক্সিরা কি আসলেই আমাদের থেকে দূরে সরছে, নাকি নিছক স্থান প্রসারিত হচ্ছে?

৯. মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিও কি প্রসারিত হচ্ছে?

১০. বিগ ব্যাং অনন্যতার (ওsingularity) পক্ষে কি প্রমাণ আছে?

১১. স্ফীতির মাধ্যমে প্রায় শূন্য থেকে আমাদের চারপাশের বস্তুর উদ্ভব কি শক্তির সংরক্ষণশীলতার লঙ্ঘন নয়?

১২. কোন জিনিস বি ব্যাং ঘটিয়েছিল?

১৩. বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ছিল?

১৪. মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কী?

১৫. ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি কী?

১৬. আমরা কি নগণ্য?

প্রশ্নগুলোর উত্তর একসাথে বসে ভাবা যাক। পরের চারটি অধ্যায়ে আমরা এগারোটি প্রশ্নের উত্তর দেব। বাকি পাঁচটি প্রশ্নে বেশ কিছু ঘোরপ্যাঁচ আছে। তবে শুরুতে কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাটির প্রশ্নটায় ফিরে যাই। আমাদের বইয়ের প্রথম অংশের মূল ভাব এটাই: স্থানের কি শেষ আছে? ২.১ চিত্রে দেখানো আছে যে বিভিন্ন শতাব্দীতে আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর নাটকীয়ভাবে বড় হয়েছে। বর্তমানে আমরা জানি, আমাদের স্থান শিকার খুঁজে বেড়ানো আমাদের পূর্বপুরুষদের জানা স্থানের চেয়ে অন্তত এক কোটি-কোটি-কোটি গুণ বড়। আসলে তাদের ক্ষেত্রে স্থানের পরিধিটা ছিল সারা জীবনের হেঁটে বেড়ানো স্থানের পরিমাণ। ছবিতে আরও দেখা যাচ্ছে, আমাদের জানা স্থানের পরিমাণ একবারে বড় হয়নি। সেটা হয়েছে বারেবারে। যখনি আমরা মহাবিশ্বকে বড় করে দেখার দেখার সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা আগে যতটুকু স্থান চিনতাম সেটা ছিল আরও বড় কিছুর অংশ।

স্থান কত বড়?

বাবা আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন: “যদি কখনও এমন জটিল প্রশ্নের মুখে পড়ো যার উত্তর তুমি পারছো না, তাহলে তুমি উত্তর দিতে পারবে না এমন আরও সরল একটি প্রশ্ন মোকাবেলা করো। ” উপদেশটা মাথায় রেখে একটা প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করা যাক। আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম কত সাইজের স্থান থাকতে পারে? ২.১ চিত্র বলছে, শতাব্দীর পরবর্তনের সাথে সাথেয়েই প্রশ্নের উত্তর নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে আমরা জানি, শিকার খুঁজে বেড়ানো আমাদের পূর্বপুরুষরা যতটুকু জানতেন, আমাদের স্থান তার চেয়ে অন্তত এক কোটি-কোটি-কোটি গুণ বড়। তারা তো শুধু জানতেন তাদের সারা জীবনে হেঁটে বেড়ানো স্থানটুকুর কথাই। ছবিটি আরও বলছে, স্থানের বিশালতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একদিনে বদলায়নি। বদলেছে বারেবারে। যখনি আমরা মহাবিশ্বকে বড় করে দেখার সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা আগে যা জানতাম তা আসলে আরও বড় কিছুর অংশ। ২.২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে আমাদের আবাসস্থল একটি গ্রহের অংশ। যেটি একটি সৌরজগতের অংশ। সেটা আবার একটি ছায়াপথের অংশ। ছায়াপথ আবার এক ছায়াপথগুচ্ছ নামক এক মহাজাগতিক বিন্যাসের অংশ। সেটা আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অংশ। পরে আমরা যুক্তি দেখাবো, এটাও আবার এক বা একাধিক স্তরের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অংশবিশেষ।

চিত্র ২.১: এই অধ্যায়ে আমরা দেখাবো, আমাদের মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন সীমানা অবিরাম বড় হয়েছে। খেয়াল করুন, এখানে উলম্ব অক্ষের (খাড়া অক্ষ) মানগুলো খুব বড় বড়। প্রতিটি আগের চেয়ে ১০ গুণ বড়।

উটপাখি যেভাবে বালিতে মাথা ডুবিয়ে রাখে আমরা মানুষরাও তেমনি সবসময় ধরে নিয়েছি, আমরা যা দেখছি তাই সব। দম্ভ করে মনে করে নিয়েছি, আমরা আছি মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। ফলে মহাবিশ্বকে বুঝতে গিয়ে আমরা সবসময়ই একে প্রকৃত আকারের চেয়ে ছোট মনে করেছি। তবে ২.১ চিত্রে দেখানো ধারণা দ্বিতীয় আরেকটি চিত্র তুলে ধরছে, যেটা আমাকে খুবই উৎসাহী করে। আমরা শুধু মহাবিশ্বের আকারকেই ছোট মনে করিনি, মহাবিশ্বের আকার বোঝার মানবিক ক্ষমতাকেও ছোট মনে করেছি। আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্কও আমাদের মস্তিষ্কের সমানই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় তারা টেলিভিশন দেখতেন না। আমি নিশ্চিত যে তারা প্রশ্ন করতেন, “আকাশে এই জিনিসগুলো কী?” এবং “এগুলো কোথা থেকে এল?” তাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর রূপকথা ও গল্প বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেননি, প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার উপায়টা তাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল। আর এর জন্যে মহাশূন্যে উড়তে শেখার দরেকার ছিল না। মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে জানার জন্য দরকার ছিল মানবিক মনকে উড়তে দেওয়া।

চিত্র ২.২: যখনি আমরা মানুষরা বড় মাপকাঠিতে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছি, আমরা দেখেছি, আমরা যা জানতাম সেটা আরও বড় কিছুরই অংশ। আমাদের আবাসস্থল একটি গ্রহের (বাঁয়ে) অংশ। সেটি একটি সৌরজগতের অংশ। সেটা আবার অংশ একটি ছায়াপথের (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)। ছায়াপথ আবার ছায়প্তহগুচ্ছ নামক মহাজাগতিক বিন্যাসের অন্তর্ভূক্ত (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ছায়াপথগুচ্ছ আবার আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অংশ (ডানে)। সেটাও হতে পারে এক বা একাধিক স্তরের সমান্তরাল মহাবিশ্বের অংশ।

ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো সফলতাকে অসম্ভব ধরে নেওয়া এবং সে কারণে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি, পদার্থবিদ্যার অনেকগুলো সাফল্যই আরও আগেই হতে পারত। কারণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তখনই উপস্থিত ছিল। আইস-হকি খেলায় আপনি যদি ভুল করে আগেই আপনার স্টিককে ভাঙা বলে ধরে নেন, তাহলে গোল করতে পারবেন না। পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখবো কীভাবে এমন আত্মবিশ্বাসী ভুলগুলোকে জয় করেছেন আইজ্যাক নিউটন, অ্যালেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান, জর্জ গ্যামো, হিউগ এভারেটরা। অতএব, পদার্থবিদ্যায় নোবেল পাওয়া বিজ্ঞানী স্টিভেন উইবার্গের সাথে আমি একমত: “পদার্থবিদ্যায় অনেক সময়ই এমন হয় যে আমরা আমাদের তত্ত্বকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে নয়, বরং যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে না নিয়েই ভুলটা করি।”

চলুন প্রথমে দেখি কীভাবে পৃথিবীর সাইজ এবং চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও ছায়াপথদের দূরত্ব বের করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে একে আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক এক গোয়েন্দা কাহিনী বলে মনে হয়। আর তর্কযোগ্যভাবে এর মাধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। তাই মূল আলোচনার আগেই প্রাথমিক কৌতূহল মেটানোর জন্যে এটা নিয়ে বলতে আমি খুবই উৎসাহবোধ করছি। পরে আমরা দেখবো কসমোলজির সর্বশেষ আবিষ্কারগুলো। দেখেই বুঝতে পারবেন, প্রথম চারটি উদাহরণে কিছু কোণ পরিমাপের চেয়ে জটিল কিছু নেই। এগুলো দেখে আরও বোঝা যাবে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার গুরুত্ব। হয়ত সেগুলোই হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

চিত্র ২.৩: চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। দুই হাজার বছর আগে চন্দ্রগ্রহণের সময় সামোস দ্বীপের অ্যারিস্টার্কাস চাঁদের সাইজকে পৃথিবীর ছায়ার সাইজের সাথে তুলনা করেছিলেন। এখান থেকে সঠিকভাবে অনুমান করেন, চাঁদ পৃথিবীর প্রায় চারগুণ ছোট। (অ্যান্থনি আয়োম্যামিটিসের তোলা সময়ান্তর ছবি)

পৃথিবীর আকার

জলপথে চলাচল শুরু হলে মানুষ খেয়াল করল, জাহাজের মূল কাঠামো পালের আগেই অদৃশ্য হয়। এটা থেকে মানুষ বুঝল, সমুদ্রপৃষ্ঠ বক্র। আর পৃথিবী গোলাকার। ঠিক চাঁদ ও সূর্যকে দেখে যেমন মনে হয়। প্রাচীন এই কথার সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের সময় তারা দেখল, চাঁদে পৃথিবীর ছায়া হয় গোল। ২.৩ নং চিত্রে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। জাহাজের চলাচল থেকে সহজেই পৃথিবীর সাইজ বের করা যায়। তবে আজ থেকে ২,২০০ বছর আগেই ইরাটোস্থেনিস শুধু কোণের কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সূক্ষ্মভাবে সেটা পরিমাপ করেন। তিনি জানতেন যে উত্তরায়ণের সময় দুপুরবেলা মিশরীয় শহর সাইনিতে সূর্য সোজা মাথার ওপর থাকে। কিন্তু আলেক্সান্দ্রিয়ায় সূর্য থাকে মাথার সোজা উপর থেকে ৭.২ ডিগ্রি দক্ষিণে। আলেক্সান্দ্রিয়ার অবস্থান সাইনি থেকে ৭৯৪ কিলোমিটার উত্তরে। এ থেকে তিনি বুঝলেন, ৭৯৪ কিলোমিটার যাওয়া মানে পৃথিবীর ৩৬০ ডিগ্রি পরিধির ৭.২ ডিগ্রি সমান অতিক্রম করা। তাহএল পৃথিবীর পরিধি হবে ৭৯৪ কি.মি. × ৩৬০০ /৭.২০। বা প্রায় ৩৯,৭০০ কি.মি.। আধুনিক হিসাবে পাওয়া মান ৪০,০৭৫ মিটার তার খুবই কাছাকাছি।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস আরও কম নির্ভুল হিসাবের উপর ভিত্তি করে চলতে গিয়ে হাসির পাত্র হন। তিনি আরবি মাইল ও ইতালীয় মাইলকে গুলিয়ে ফেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, প্রাচ্যে পৌঁছতে হলে তাকে ৩,৭০০ কি.মি. পথ অতিক্রম করতে হবে। অথচ আসলে করতে হত ১৯,৬০০ কি.মি.। হিসাব সঠিকভাবে করলে তিনি এই অভিযাত্রার জন্যে বরাদ্দও পেতেন না। আর আমেরিকার অস্তিত্ব না থাকলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হত না। মানে কোনো কোনো সময় সঠিক হওয়ার চেয়ে ভাগ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চাঁদের দূরত্ব

সূর্য বা চন্দ্রগহণ যুগে যুগে মানুষের মাঝে আতঙ্ক, ভয় ও কল্পকাহিনির জন্ম দিয়েছে। সত্যি বলতে, কলম্বাস জ্যামাইকায় আটকে পড়লে চন্দ্রগ্রহণের পূর্বাভাস বলে দিয়ে স্থানীয়দেরকে ভয় দেখাতে সক্ষম হন। সেটা ছিল ১৫০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির সূর্যগ্রহণ। তবে চন্দগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের আকার সম্পর্কে একটি সুন্দর ক্লু পাওয়া যায়। দুই হাজার বছরের বেশি সময় আগে ২.৩ চিত্রটি দেখেছিলেন। পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে চলে আসলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। এ সময় চাঁদে পতিত পৃথিবীর ছায়ার একটি বক্র প্রান্ত থাকে। আর পৃথিবীর গোল আকৃতি চাঁদে চেয়ে কয়েক গুণ বড়। অ্যারিস্টার্কাস বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছায়াটি পৃথিবীর সত্যিকার আকারের চেয়ে কিছুটা ছোট। কারণ পৃথিবী সূর্যের চেয়ে ছোট। কিন্তু তিনি সঠিকভাবে এই জটিলতার সমাধান করে পরিমাপ করে বলেন, চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৩.৭ গুণ ছোট। ইরাটোস্থেনিস তো পৃথিবীর আকার আগেই বের করে ফেলেছেন। অতএব এখন শুধু তাকে ৩.৭ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। পেয়ে গেলেন চাঁদের পরিধি। আমার মতেই এই মুহূর্তটিতেই মানুষ পৃথিবীর বাইরে গিয়ে মহাশূন্যকে জয় করা শুরু করেছে। অ্যারিস্টার্কাসের আগেও বহু মানুষ চাঁদের দিকে তাকিয়েছে। আর আশ্চর্য হয়ে ভেবছে, চাঁদ না জানি কত বড়! কিন্তু সেটা জানলেন প্রথম অ্যারিস্টার্কাস। আর কাজটি তিনি করলেন মানসিক শক্তি দিয়ে। রকেটের শক্তি দিয়ে নয়।

অনেকসময় একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আরেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সহজ করে দেয়। আর এক্ষেত্রে চাঁদের আকার জানার সাথে সাথে জানা হয়ে গেল এর দূরত্ব। আপনার হাতকে বাহুর দৈর্ঘ্য পর্যন্ত প্রসারিত করুন। এবার দেখুন আপনার কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে কতটুকু দৃশ্য বন্ধ করে রাখতে পারেন। আপনার এই আঙ্গুলটি প্রায় এক ডিগ্রি\*২ সমান জায়গা দখল করে। চাঁদকে ঢাকতে এর অর্ধেক জায়গা দরকার হয়। পরেরবার চাঁদ দেখলেই এই ব্যাপারটা দেখে নেবেন। একটি বস্তুকে অর্ধেক ডিগ্রি স্থান দখল করতে হলে একে আপনার থেকে এর আকারের প্রায় ১১৫ গুণ দূরে থাকতে হবে। তার মানে আপনি বিমানের জানালা দিয়ে ৫০ মিটারের (অলিম্পিক সাইজের) একটি সুইমিং পুল আঙ্গুল দিয়ে এভাবে ঢাকতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি ১১৫ × ৫০ মিটার বা ৬ কিলোমিটার উচ্চতায় আছেন। ঠিক এইভাবেই অ্যারিস্টার্কাস চাঁদের আকারকে ১১৫ দিয়ে গুণ করে এর দূরত্ব মাপেন। দেখা যায় সেটি পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৩০ গুণ\*৩।

সূর্য ও নক্ষত্রদের দূরত্ব

তাহলে সূর্য? কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়ে একেও আটকানোর চেষ্টা করুন। দেখবেন, চাঁদের মতো প্রায় সমান জায়গা দখল করছে এটি। প্রায় অর্ধেক ডিগ্রি। অবশ্যই এটি চাঁদের চেয়ে দূরে আছে। কারণ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে দেয়। কিন্তু সূর্য কতটা দূরে আছে? সেটা নির্ভর করে আকারের ওপর। যেমন সূর্য যদি চাঁদের তিন গুণ হয়ে থাকে, তাহলে সমান কোণ পরিমাণ জায়গা দখল করতে হলে একে তিন গুণ বেশি দূরে অবস্থিত হতে হবে।

লেখকের নোট (অনুবাদকের নোটগুলো তারকা চিহ্ন দিয়ে নাম্বারিং করা হয়েছে)

১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় d2/2h, যেখানে d হলো সর্বোচ্চ যে দূরত্বে আপনি h উচ্চতার একটি পালকে সমুদ্র স্তর থেকে দেখতে পারেন।

অনুবাদকের নোট

\*১। অধিবিদ্যা হলো দর্শনের একটি শাখা। এখানে বাস্তবতার (reality) বৈশিষ্ট্য, মন ও বস্তুর সম্পর্ক, বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং সম্ভাবনা ও বাস্তবতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অধিবিদ্যা আসলে দুই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। কী আছে এবং সেটা কেমন?

\*২। পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত ১৮০ ডিগ্রি। তার মানে চাঁদ, সূর্য বা নক্ষত্ররা উদিত হয়ে আবার অস্ত যেতে যেতে ১৮০ ডিগ্রি কোণিক পথ অতিক্রম করে। এই যাত্রাপথেই চাঁদ নির্দিষ্ট কোনো সময়ে অর্ধেক ডিগ্রি স্থান দখল করে।

\*৩। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৪২ কিলোমিটার। আর চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। ভাগ দিলে ৩০ এর একটু বেশি হয়।